মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ গল্প

নিলুর প্রস্থান

জসিম মল্লিক

১.

চারিদিকে পানি আর পানি। বন্যার প্রকোপ চারিদিকে। তার উপর কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি অনেকদিন দেখেনি এ অঞ্চলের মানুষ। পানিতে সব ডুবে গেছে। শুধু ঘরের মধ্যেই যা পানি উঠতে বাকি। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে হলে নৌকা লাগে। পুকুর আর জমিন সব একাকার হয়ে গেছে পানিতে। গাঙ্গের পানি ফুলে উঠেছে। পানি বাড়ছেই প্রতিদিন। নদী দেখলে বুকটা কেঁপে উঠে। কী তার গর্জন! কী তার তেজ। বড় বড় ঢেউ ওঠে একটু বাতাস দিলেই। অথচ কত ছোট্ট নদীটা। নদীটা খায়েদের বাড়ি থেকে খুব একটা বেশী দুরে না। দেখা যায় আর কি। নদীর ঢেউয়ের শো শো শব্দও শোনা যায় খায়েদের বাড়ি থেকে। সবাই বলা বলি করছে এবার একটু অসময়ে বন্যা শুরু হয়েছে।

কাশেম তালুকদার প্রতিদিন রাত হলে খায়েদের বাড়িতে আসে তাস খেলতে। কাশেম তালুকদারদের বাড়িটা খায়েদের বাড়ি থেকে দু'কিলোমিটার পশ্চিমে। কাশেম মিয়া এ অঞ্চলের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। ষাট সালের ম্যাট্রিক পাশ। কম কথা না। ভালো ইংরেজী জ্ঞান রাখে। লোকজন তাকে সমঝে চলে। কাশেম তালুকদারের বয়স তিরিশ হবে। তাগরা জোয়ান মানুষ। একটু আয়েশী বটে। জমি জমা আছে প্রচুর। কাশেম তালুকদারের অন্য দু'ভাইয়ের অনেকগুলো করে ছেলে মেয়ে থাকলেও তার মাত্র দুটি। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স ছয়, মেয়েটির চার। ফ্যামিলি প্যানিং করে সে। অন্য দু'ভাইয়ের মতো সে দু'তিনটা করে বিয়েও করেনি। মাত্র বাইশ বছর বয়সে কাশেম মিয়ার বিবাহ হয়। কাশেম ভাইদের মধ্যে সবার ছোটো। তারা মোট তিন ভাই পাঁচ বোন। তার একটাই খারাপ অভ্যাস সে স্ত্রীকে মারধর করে। যেদিন মদ পাশা খেয়ে বাড়িতে ফেরে সেদিন পাড়া পড়শিরা বুঝে ফেলে। রাতের বেলা কাশেমের স্ত্রী মরিয়মের ফুপিয়ে কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। মরিয়ম এ তলাটের সবচেয়ে রূপবতী। ডিগির পাড়ের মেয়ে।

বর্ষা বাদলার দিন। সাপ খোপের ভয় আছে । চোর ডাকাতের ভয়ও থাকতে পারে। তাই কাশেম তালুকদার রাতে চলাচলের সময় কিছু অস্ত্র শস্ত্র সাথে রাখে। একটা ছয় ব্যাটারির টর্চ , সাত কাটার চাকু। অন্য কোনো অস্ত্র থাকলেও থাকতে পারে। বর্ষাকাল বলে একখানা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা ব্যবহার করে। ভরা বর্ষার সময় ছলাৎ ছলাৎ করে ধান খেতের মধ্যে দিয়ে নৌকা করে যায়। কখনো বৈঠা

কখনও লগি ব্যবহার করে। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে যখন যায় তখন বৈঠা লাগে। সাপ খোপকে ভয় খায় না কাশেম তালুকদার। তবে দিনকাল খুবই খারাপ এখন। দেশে মুক্তিমুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যে কোনো সময় কলসকাঠির দিকে পাক বাহিনী এসে যাবে। পানিটা নেমে গেলেই। শোনা যায় কাশেম মিয়ার কাছে পিস্তল আছে। তাস খেলার ছলে খায়েদের বাড়িতে বসে যুদ্ধের খোঁজ খবর করে। তবে ব্যাপারটা খুব গোপন। কাউকেই বলে না। আসে পাশে রাজাকারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কাশেম মিয়ার কিছু একটা প্যান আছে।

দশ বছরের কামালের গ্রাম একদমই ভালো লাগে না। তাও আবার এরকম বর্ষা বাদলার দিনে। কোথাও যেতে পারে না, খেলতে পারে না। অন্যান্য সময় গ্রামে আসে শীতের দিনে। তখন অনেক মজা হয়। কামালকে আসতেই হয় মায়ের সাথে। কামালের এক বোন নিলুফাও সাথে আসে। নিলুর বয়স ষোলো। এখনও বিয়ে হয়নি। নিলু শ্যামলার মধ্যে অতিশয় রূপসী দেখতে। কামালের অন্য ভাইয়েরা শহরেই আছে। বরিশাল শহরে। তবে মেঝো ভাই জামাল এখন কোথায় আছে কেউ সঠিক জানে না। সম্ভবত ইন্ডিয়া চলে গেছে বর্ডার ক্রস করে। মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিতে। কামালের মা সারাক্ষন কাঁদে জামালের জন্য। বড় ভাই আলম সরকারী চাকরী করে। বরিশালেই। তার সংসার আছে। ছোট্ট ছোট্ট দুটি মেয়ে। কামাল ভাবির কাছে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ছোট্ট কামালের কথা কেউ শোনে না। তাকে মায়ের সাথে সাথে যেতে হয় সব জায়গায়। কামাল ঠিকই মাকে ছাড়া একলা থাকতে পারবে কিন্তু ওর কথা কেউ শোনে না। বাড়িতে সব খেলার সাথীদের রেখে কার ভালো লাগে। যাদিও এখানে কামালের সমবয়সী মামাতো ভাই বোনরা আছে। কামাল শহরে থাকে বলে ওদের সবাই অন্য চোখে দেখে। আদর করে। কামালের মামা বাড়িটা ভিষন অজ একটা গ্রাম। কামালের নানা নানী বেঁচে নেই বলে মামা বাড়ি বলে ওরা। শহরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় হচ্ছে নৌকা অথবা লঞ্চ। দিনের মধ্যে তিনবার লঞ্চ বরিশাল থেকে পটুয়াখালী যায় এবং আসে। ভোর ছয়টায় একটা, দুপুর বারোটায় এবং বিকেল চারটায়।

কামালের বাবা নেই। ওই সবার ছোট। কামালের মা জয়নব বিবি একটু কড়া ধাচের মানুষ। কামালের তিন মামা। কাশেম তালুকদার হচ্ছে ছোট্ট মামা। কামালের সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে মোঝো মামা। নবী তালুকদার। নবী মামা কামালদের সব ভাইবোনকে খুব আদর করে। বড় মামা সফদার তালুকদার। সে একটু কড়া প্রকৃতির। কামালের মায়ের মতোই। সবাই সফদার মামাকে ভয় পায়। মুখভরা দাড়ি , পাঁচওয়াক্ত নমাজ পড়ে। নিয়মিত আজান দেয়। ভোররাতে যখন আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম..বলে ফজরের আজান দেয় তখন বড়ই সমধুর শোনা যায় মামার কণ্ঠ। অন্যরকম একটা অনুভূতি জাগে মনে। এমনিতে মামার বাজখাই গলা শুনলেই কামাল ভয়ে কাঁপে। বড় মামাকে কামাল এড়িয়ে চলে। যদিও কামালের মাকেই বড়মামা সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে।

প্রতি বছর মা মামা বাড়ি আসে ধান পান ঠিক করতে। কামালদের অনেক জমি জমা আছে ঢাপরকাঠিতে। বড় মামাই সব তদারকি করে। সেজন্য কামালকে মায়ের সাথে বছরে দু'তিন মাস করে থাকতে হয়। সেটা শীতের সময়। কিন্তু এবারের ব্যপারটা আলাদা।

বাড়িতে আরো অনেক মানুষ। নতুন লোকজন। গম গম করছে নারী পুরুষে। বড় মামার বড় মেয়ের শশুর বাড়ির আত্বীয়স্বজন। তার নাম কমল। শহরে বিয়ে হওয়ায় কমলের কদর অনেক। তার বয়সী আরো কয়েকজন মেয়ে আছে এ বাড়িতে কিন্তু তাদের কারোরই শহরে বিয়ে হয়নি। যার সাথে বিয়ে হয়েছে তার নাম আলতাফ কাজী। সে কন্ট্রাকটরি করে। তার ভালো পয়সা পাতি আছে। তাদের একটা তিন বছরের ছেলে আছে। নাম মাসুম। খুব আদুরে ছেলেটি। কামালের সাথে খুউব খাতির হয়ে গেছে বাচ্চাটার।

শহুরে মানুষ সবাই। এরকম অজ গ্রামে এদের আসার কথা না। বিপদে পড়ে এসেছে। যারা এসেছে তারা আর কামালরা একই শহরের। তবে কামাল এদের আগে থেকে চিনতো না। সুন্দর সুন্দর মেয়েরা আর ছেলেরা এসে উঠেছে মামা বাড়িতে। একটা উৎসব উৎসব ভাব। দেশে যে যুদ্ধ চলছে তার কোনো ছোঁয়া লাগেনি বাড়িটিতে। প্রচুর রান্না রান্না হচ্ছে। সবাই আরাম আয়েশে আছে। কাশেম তালুকদার ভোর রাত বাড়িতে ফেরে। সকাল হলে বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকা থেকে যুদ্ধ নিয়ে কি বলেছে সেসব বলে। সবাই মন দিয়ে শোনে। যারা এসেছে শহর থেকে সবাই বেশ বড় বড়। কামালের বোন নিলুর চেয়েও বড়। কামালের বয়সী একজনও নেই। একটি মেয়ে এসেছে সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখতে। বরিশাল মেডিক্যালে পড়ে। এসব মেয়েদের শহরের বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। নিলুকে নিয়েও ভয় আছে। তাই সবাই মিলিটারীদের ভয়ে ঢাপারকাঠিতে নিরাপদ জায়গায় পালাতে এসেছে।

মোস্তফা হচ্ছে কামালের খালাতো ভাই। বড় খালার ছেলে। কামালের মতো মোস্তাফারও বাবা নেই। মোস্তাফা কামালের চেয়ে কমপক্ষে ছয় বছরের বড়। নিলুর বয়সী। আবুলেরও তাই। আবুল হচ্ছে বড় মামার ছেলে। বড় মামার একদম বড় ছেলে বছুর দুই আগে শহরে চাকরী করতে এসে কী একটা অজানা রোগে মারা গেছে। তার নাম রশিদ। দেখতে খুব সুদর্শন ছিলো। রশিদকে হারানোর দুঃখ এই বাড়িতে অনেক দিন ঘুরে বেড়াবে। কামালের বড় ভাই আলমের সাথে রশিদের খুব খাতির ছিলো। দুজনে প্রায় এক বয়সিতো তাই। রশিদ, কমল, আবুল আর আয়েশা। এরা সবাই বড় মামার প্রথম ঘরের সন্তান। আয়েশা কামালের বয়সী। বড় মামী বছর পাঁচক আগে ওলা ওঠা রোগে মারা যায়, আয়েশার বয়স তখন মাত্র পাঁচ। বড় মামা বেশী দেরী না করে আবার বিবাহ

করে। বড় মামার দ্বিতীয় স্ত্রী যথেষ্ট ভালো মানুষ। কামালদের খুব আদর করে। আগের মামীর চেয়েও বেশী।

মোস্তাফাদের বাড়িটা আবুলদের বাড়ির কাছেই। বেড়ার এপার আর ওপার। ডাক দিলে শোনা যায়। কামালের বেশী খাতির মোস্তোফা আর আবুলের সাথে। বয়সের পার্থক্য যাই থাক আবুল কামালকে খুব মূল্য দেয়। সব জায়গায় নিয়ে যায়। অনেক সুন্দর গান করে আবুল। খোলা গলায় যখন আব্দুল আলিমের গান ধরে তখন কী অপূর্বই লাগে। মামাদের বাড়ি অনেকে লোকজন থাকায় কামাল, নিলু আর ওর মা থাকে বড় খালার বাড়িতে। বড় খালার দুই মেয়ে। সুফিয়া আর খাদিজা। সুফিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। সে আর কমল এক বয়সী। খাদিজার বয়স আঠারো হবে। তার বিয়ের কথা বার্তা চলছে। রাতে কামাল প্রায়ই খাদিজা আপার সাথে শোয়। নিলু মায়ের সাথে থাকে। খাদিজা কামালকে অনেক আদর করে। কামালের ভালো লাগে খাদিজাপা'র সাথে শুতে।

মোস্তাফাদের বাড়িতেও ঢাকা থেকে একটি ফ্যামিলী পালাতে এসেছে। সেখানে একটি ছেলে আছে। ঢাকা মেডিক্যালে পড়ে। থার্ড ইয়ার। বিশ বছর বয়স। খুব সন্দর দেখতে। ফিরোজ নাম। তার কাছে কামাল অনেক গল্প শোনে। পাকিস্তান কি ভাবে বাংলাদেশকে শোষন করেছে, কী ভাবে অর্থনৈতিক নিপীড়ন করছে এসব গল্প সে করে। সে সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে তার গল্প দিয়ে। নিলুর প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। নিলুও মনে হয় তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তার দুটি বোন এসেছে পরীর মতো দেখতে। কামালের সাথে খেলা করে ওরা। কামালের বয়সী। কিন্তু কামাল কোনো যেনো এই শহুরে মেয়ে দুটিকে বেশী পছন্দ করে না। কামালের পছন্দ তার মামাতো ভাই বোনদের। এগারো বারো বছরের দুই তিন জন বোন আছে কামালের। এরা মোঝা মামার মেয়ে। মেঝো মামার তিন বিয়ে। একজন স্ত্রী মারা যায় আবার একটি শ্যালিকা ধরে এনে বিয়ে করে মামা। না হলে মামার এতো বড় সংসার কে দেখবে? মাজেদা সারাক্ষন কামালের সাথে আঠার মতো লেগে থাকে। মাজেদার বয়স মাত্র বারো কিন্তু সে বেশ বাড়ন্ত দেখতে। দুরন্ত প্রকৃতির। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে অনেক লোকজন বলে কেউ কিছু খেয়াল করে না। কামাল সবসময় মাজেদার সঙ্গী হয়।

কামালের বড় বড় বোনরা প্রায়ই জামাল ভাইকে নিয়ে আলাপ করে। কি কি সব বলে। জামাল ভাইকে সবাই পছন্দ করে। জামাল ভাই বোনদের কাছে হিরো। জামাল সুদর্শন। স্মার্ট। তার উপর সে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে ইন্ডিয়া গেছে। জামাল ভাইকে পাওয়া কি অত সহজ! কামালরা পাঁচ ভাই বোন। জোছনা আপা হচ্ছে মেঝো। তার বিয়ে হয়েছে রাকুদিয়ায়।

২.

একমাস আগের কথা। সবাই যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। অন্ধকার রাত। শহর খালি হয়ে গেছে। দুপুরের দিকে বরিশাল শহরের উপর পাকিস্তানের যুদ্ধ বিমান বোমাবর্ষন শুরু করে। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও কামাল ওদের বাড়ির সামনের খেলার মাঠে মক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেখছিল। ওর বয়সী কয়েকজন আছে যারা বড়দের ফুট ফরমাস খাটে। হান্নান, নিজাম, মিজানুর, হাসিব। পানি খাওয়ায়। চা টা এনে দেয় বাড়ি থেকে। ট্রেনিং এ জামাল ভাইও ছিল। দুপুর একটার মতো হবে তখন। হঠাৎ যেনো দুনিয়ায়াতে গজব নেমে এলো। কান ফাটানো ঠা ঠা শব্দে সব একাকার হয়ে যেতে লাগলো। ছত্রখান হয়ে গেলো ট্রেনিং। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। জামাল ভাই চিৎকার করে কামালকে বললো, কামাল বাড়ি যা। মার কাছে যা। কমাল দৌড়ে বাড়ির ভিতরে চলে এলো। দেখলো কেউ নেই। সবাই বাড়ির পিছনে যে বেড়া তার মধ্যে লুকিয়েছে। কামাল উপুর হয়ে নইল গাছটার নিচে শুয়ে পরলো। কামাল জানে এভাবে শুয়ে পরতে হয়। ট্রেনিংএ অনেক কিছু শেখায়। মনে মনে আলাহকে ডাকছে আর ভাবছে আজকেই ওর শেষ দিন। এ রকম বোমাবর্ষন হলে আর কেউ বাঁচে না। সবাই মারা যায়। মার কথা খুব মনে পরলো। মা যে কোথায় কে জানে। নিলুইবা কোথায়!

আধা ঘন্টার মধ্যে সব থেমে গেলো। থেমে গেলেও সাবাই ভাবলো আবার বোমাবর্ষণ শুরু হবে। কেউ লুকানো অবস্থা থেকে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। কামালও ওভাবেই শুয়ে থাকলো। ও যে এখনও বেঁচে আছে এটা ভেবে আশ্চর্য্য হলো। গায়ে চিমটি কেটে দেখেলো সত্যি সত্যি ব্যথা। এভাবে কিছু সময় পার হওয়ার পর সবাই যে যার অবস্থা থেকে উঠে আসলো। বেড়ার মধ্যে যারা লুকিয়েছিল তাদের অবস্থা হলো ভয়াবহ। কেউ কেউ গু তে মাখা মাখি হয়ে গেছে। এই নিয়ে হাসা হাসি হলো এক প্রস্থ। কিন্তু সবার মনের মধ্যে আতঙ্ক। এর পর কি হবে? শহরে মিলিটারি নেমে যাবে। সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। লাইন দিয়ে দাড় করিয়ে নাকি গুলি করে ওরা। অতএব পালাতে হবে।

এর আগের দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক লোককে মুক্তিবাহিনীর লোকরা ধরে এনে গুলি করে মেরেছিলো প্রকাশ্যে। লোকটা পাকিস্তানের গুপ্তচর ছিলো। স্টেডিয়ামের মাঠে লোকাটাকে বেঁধে তারপর গুলি করে মারা হয়। মেরে লোকটার মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে বিলানো হয়। কামাল শুনেছে মজনু ভাই নাকি মাংসের টুকরো নিয়ে এসেছিলো। তখনই সন্দেহ হয়েছিলো কিছু একটা ঘটবে শহরে।

আলম ভাইর অফিসের একটা দুই দরজার টয়োটা স্টারলেট গাড়ি আছে। শহরে এ রকম কয়েকটি মাত্র গাড়ি চলে তখন। অফিস টফিস সব বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। সাত মার্চ ১৯৭১ সালের বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পরই কার্যত সব বন্ধ। গাড়িটা আলম ভাইয়ের অফিসের ম্যানেজারের। সরকারী ব্যাংকের ম্যানেজার। ম্যানেজার সাহেবের বাড়ি অন্য জেলায়। গাড়িটা কমালদের বাড়িতে থাকে। এই সুযোগে আলম ভাই ওটা দিয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং করে। আলম ভাই চালায় আর পোলাপানরা গড়ির পিছন পিছন দৌড়ায়। একদিন হয়েছে কি আলম ভাই দরগা বাড়ির কাছে গাড়িটা ব্যাক করতে গেছে ওমনি গিয়ে লেগেছে একটা গাছের সাথে ধাক্কা। ব্যস। পিছনের গাস চুর চুর করে ভেঙ্গে চৌচির। ঝুর ঝুর করে কেমন সব ঝরে পড়লো।

কামালরা ঠিক করলো পালাবে। রাকুদিয়া যাবে। বেশী একটা দুর না। দশ বারো মাইল হবে। কি ভাবে যাবে? বাস টাস বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক হলো ব্যাংকের গাড়িতে করেই যাবে। আলম ভাই তখনও ভালোমতো ড্রাইভিং শেখেনি। অগত্যা গাড়ির যে ড্রাইভার তাকে হাতে পায়ে ধরে খবর দিয়ে আনা হলো। সে ছিলো খুব সাহসী লোক। রাতের অন্ধকারে কামালরা রওয়ানা হলো রাকুদিয়া বড় আপার বাড়িতে। দোয়ারিকা ফেরি পার হলেই বড় আপাদের বাড়ি। জাব্বার ভাই তহশিল অফিসে চাকরি করে। আয় ইনকাম ভালো। বদলির চাকরি। এখন অবশ্য বাড়িতেই। সর্বশেষ যশোহরে ছিলো। তার তিন ছেলে মেয়ে। বড়টার বয়স আট। কামালের দুই বছরের ছোট মাত্র। মাসুদ নাম। এর পরেরটা মেয়ে। তারপর আবার ছেলে। ছেটোটার বয়স মাত্র দুই।

বড় আপার বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো। জমি জমা আছে। খেজুরের রস, আখের গুর এসব হয়। আখের রস জাল দিয়ে প্রচুর গুর হয়। বাজারে সেই গুর বিক্রি হয়। ফল ফলাদি চাষ করে। বাঙ্গি, তরমুজ, খিরাই এসব হয়। নারকেল গাছ আছে অনেক। একবার হয়েছে কি কামাল নারকেল গাছে উঠেছে। তখন গাছের মাথায় উঠে গেছে। হঠাৎ দেখে মিলিটারি আসছে। কামাল এমন ভয় পেয়েছে। নিচে ছিল নিজাম, দুলাল , মাসুদ। ওরা সব দৌড়ে পালিয়েছে। কামাল করলো কি ভয়ে হাত ছেড়ে দিয়েছে। ঝর ঝর করে নিচে নেমে এলো। কামালের পায়ের দু ফাকে এমন ছড়ে গিয়েছিল যে সেটা ওকে অনেকদিন ভুগিয়েছে। ঘা হয়ে গিয়েছিলো। পেকে পুঁজ হয়ে যায়। কয়েক মাস লেগেছিলো ভালো হতে। কারণ কামাল কোনো ওষুধ দেয়নি। কাউকে বলেও নি। বললেও ওই সময় কোনো কাজ হতো না। তখন সবাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ধাপরকাঠি যাওয়ার পরও সেই ঘা ছিলো। প্রতিদিন সকাল হলে দেখতো পেকে আছে ঘায়ের যায়গাটা। পুঁজ বেড় করে মাঝে মাঝে বরিক পাউডার নারকেল তেলে মাখিয়ে লাগাত। তাতে আরো পেকে যেতো।

তো কামালরা রওয়ানা হয়েছে বড় আপাদের বাড়িতে। মা, নিলু, আলম ভাই ভাবি সহ আরো অনেকে। রাতের অন্ধকার। দেখতে পেলো অনেকেই পালাচ্ছে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রিকশায়, কেউ ঠেলা গাড়িতে। মাঝে মাঝে দেখতে পেলো মুখে কাপড় বাধা কারা যেনো লোকজনকে সাহায্য করছে। মনে হয় এরা মুক্তিযোদ্ধা হবে। গাড়িতে কয়েকটা ট্রিপ দিতে হবে। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাছ কেটে বেরিকেড দিয়েছে। মুখ বাধা লোকগুলো গাছ সরিয়ে যাওয়ার পথ করে দিচ্ছে। ভাগ্য ভালো সে রাতে দোয়ারিকার ফেরি চালু ছিল।

বড় আপাদের বিরাট বড় বাড়ি। কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না থাকতে। দু'দিন পর আবার বিমান হামলা। দোয়ারিকার অদুরেই শিকারপুর ফেরিঘাট। সেখানে ফাইটার পেন থেকে বোমাবর্ষন করা হলো। ওখানে লঞ্চঘাটে দুটি লঞ্চ বাধা ছিল। সেই লঞ্চ বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হেলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দুর থেকেই দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। এই পথেই ঢাকা থেকে মিলিটারিরা আসবে বরিশাল শহরে। এ জন্য রাস্তা ক্লিয়ার করা হলো বোধহয়। এবং বিকালের দিকেই মিলিটারি এসে গেলো সড়ক পথে।

কামালরা এখানেও নিরাপদ মনে করলো না। আরো গ্রামের দিকে পালিয়ে গেলো সেই রাতে। জব্বার ভাইয়ের কোনো এক আত্মিয়ের বাড়িতে। যাওয়ার সময় দেখতে পেলো রহমতপুরের দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর মূর্হুমুহু গুলির আওয়াজ। এমন আওয়াজ যে বুক কেঁপে উঠে। বাতাসে শিষ কেটে যায় রাইফেলের গুলি। মিলিটারিরা যাওয়ার পথে পথে ধ্বংষজজ্ঞ চালিয়ে যায়। আগুন ধরিয়ে দেয় বাড়ি ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। কামালরা এখানে বেশ কয়েকদিন পালিয়ে থাকে। এর মধ্যে হয়েছে কি একরাতে ডাকাত পরলো। বড় আপার সব নিয়ে গেলো। সোনা দানা টাকা পয়সা সব। ডাকাতদের উৎপাতে কামালরা আবার ফিরে এলো রাকুদিয়ায়। বড় আপার বাড়িতে দু'দুবার মিলিটারিরা এসেছিলো। তারা মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করে। বড় আপার দেবর মানিক মামা মুক্তিবাহনীতে যোগ দিয়েছে। বাড়ির যুবতী মেয়েদের ড্রামের ভিতর লুকিয়ে রাখা হয় যখনই মিলিটারিরা আসে। এর মধ্যে নিলুও ছিলো।

একদিন দুপুরে মিলিটারিরা এলো। সাথে কয়েকজন বাঙ্গালি লোক। অচেনা। মানিক মামার খোঁজে। বাড়ির সব পুরুষদের ধরে এনে লাইন দেওয়া হলো। গুলি করে মেরে ফেলা হবে। কামাল দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো। একটু আগেই ওরা বাড়র পিছনে রাইফেল বানানোর খেলা খেলছিলো। বেয়োনেট বানাচ্ছিলো কাঠ দিয়ে। ওরা খুদে মুক্তিযোদ্ধা। এখন ভয়ে সব ফেলে এসেছে। মনে মনে ভাবলো না জানি দেখে ফেলেছে। কামাল দুর থেকেই দেখেছে মিলিটারিরা আসছে। মানিক মামার আম্মা কোরান তেলোয়াত শুরু করে দিয়েছে । বার বার ভুল

হচ্ছিল। ভয়ে কী পড়ছে নিজেই জানে না। মেয়েরা কান্না কাটি করছে। রাইফেলেরে খটা খট আওয়াজ হচ্ছে। সবার চোখ বেঁধে ফেলেছে রাজাকাররা। এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। একটু পরই কতগুলো মানুষ লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। কি নির্মম। কি ভয়াবহ। কিন্তু কি মনে করে মিলিটারিরা গুলি করলো না। কয়েকজনকে রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মারলো। তারপর চলে গলো। যাওয়ার সময় কি কি সব বলে গেলো উর্দুতে। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসে সবার সে কি কান্না। কামালরা পরদিনই আবার বরিশাল চলে এলো।

৩.

ঢাপর কাঠির মানুষের জীবন চলতে থাকে নিস্তরঙ্গ। কাশেম তালুকদার মাঝে মাঝে এটা ওটা খবর দেয়। সকাল হলে শহরের অতিথিদের নানা গল্প শোনায়। বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা কি কি খবর দিলো যুদ্ধ সম্পর্কে সে সব রিলে করে। বেশীরভাগই হতাশার গল্প। মিলিটারিরা আস্তে আস্তে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। স্কুল কলেজ, অফিস আদালত চালু হচ্ছে। বাঙ্গালিদের সাময়িক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ছে ধীরে ধীরে। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। সাথে যোগ হচ্ছে নতুন উৎপাত রাজাকার আল বদর। এসব গল্প শোনায় ছোট মামা কাশেম তালুকদার।

শহরের অতিথিদের সাথে কামালের খাতির জমে উঠে এটকু একটু। কামাল একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে। আনিস মামা বেশ খাতির করে কামালকে। তাদেরও কিছু করার নেই আসলে। একমাস হয়ে গেছে এসেছে। এখন ফিরে যাওয়ার জন্য পায়তারা চলছে। আনিস আর শাহিন মামা প্রায়ই কাশেম তালুকদারের সাথে গোপন শলা পরামর্শ করে। কামালের কিছুই ভালো লাগে না। সে ফিরে যেতে চায় বাড়িতে। স্কুল খুলে গেছে বলে শুনেছে। কিন্তু মা নির্বিকার। মা না গেলে কামাল যাবে কিভাবে! কামাল যে কবে বড় হবে! কবে ও নিজের মতো চলতে পারবে। কামালের তখনও খতনা হয়নি। কিভাবে যেনো ব্যাপারটা জেনে যায় শহর থেকে আসা লোকগুলো। তারা এটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করলো একচোট। মিলিটারিরা যদি জানে ব্যাপারটা তাহলে! ভাববে হিন্দু। কামালের খুব লজ্জা লেগেছে। কেনো যে মা এসব খেয়াল করে না। মা খুব শক্ত প্রকৃতির মানুষ। বাবা মারা যাওয়ায় মাকে অনেক কষ্ট করে সংসারটা চালাতে হচ্ছে। আলম ভাইয়ের সামান্য পয়সায় সংসার চালানো সত্যি কঠিন।

মা শাক পাতা যোগাড় করে খাওয়া তৈরী করে। সব ধরনের তরি তরকারির গাছ লাগায়। মার হাতে যাদু আছে। যা রোপন করে তাই লক লকিয়ে উঠে। ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, সীম, লাউ, ধুন্দুল, চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া. শশা এসব লাগায়। কামাল ছোটো ছোটো কাচি শশা ছিড়ে ছিড়ে খায়। একবার কামাল একটা কলা গাছ লাগিয়েছিল বাড়ির পিছনে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সেই গাছ দেখতে যায়। কত

টুকু বড় হলো। কিন্তু কামালরা পালিয়ে যাওয়ার পর গাছটা একদিন মরে যায়। কামালের একটা ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা ছিল। খুব কিউট দেখতে। ওর সাথে খেলতো। কামাল ছাগলটাকে ঘাস পাতা খাওয়াতো। খুব আপন হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু একদিন কে যেনো ছাগলটার একটা পা ভেঙ্গে দিল। অবোধ ছাগলটা কেঁদে কেঁদে কামালের কাছে তার কষ্টের কথা জানাতো। কামাল ছাগলটার ভাষা বুঝতে পারতো। ছাগলটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগলো। জামাল ভাই ছাগলটাকে একদিন জবাই করলো। জামাল ভাই কেমন নিষ্ঠুর। কামাল অনেক কেঁদেছিল। ছাগলের মাংস দিয়ে বিরিয়ানি রান্না হলো। কামাল সেই মাংস খায়নি।

জামাল ভাই খুব মাছ মারতে পছন্দ করে। ভোর রাতে চলে যায় জাল নিয়ে মাছ ধরতে খালে। আগের রাতে বিভিন্ন জায়গায় আদার ফেলে রাখে। মাছেরা আসে আদার খেতে। সেখানে জাল ফেলে মাছ মারে। জাল ভরে মাছ উঠে আসে। কামাল ঘুম ঘুম চোখে মাছ টোকায়। হাতে থাকে হারিকেন। বর্ষার দিনে খুচইন দিয়ে মাছ ধরে। সারারাত খুচইন পাতা থাকে। ভোরে গিয়ে দেখা যায় কত ধরনের মাছ। বাইলা, চিংরি, মলা, বাইন কত ধরনের মাছ। তাজা মাছ। ছর ছর করে লাফায়।

বন্যার প্রকোপ কমে যাওয়ায় পানি নেমে গেছে। কিন্তু প্যাক প্যাকা কাদা রয়ে গেছে। এক হাটু কাদার মধ্যে চলাচল করতে হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। একটানা তিন চারদিন চলে সেই বৃষ্টি। কখনও কখনও কামালের মনে হয় একা একাই চলে যায় বাড়িতে। যা হয় হবে। লঞ্চে উঠে চলে যায়। কামাল যায় নৌকায় করে মায়ের সাথে। সকালে নৌকা ছাড়বে আর পৌঁছাবে রাতে। নৌকায় বাদাম তুলে যাবে মাঝি। মামী খবার দিয়ে দেবে সেই খবার খাবে কামালরা। নৌকা বোঝাই থাকবে ধান চাল। আরো কত কি দিয়ে দেবে বড় মামা। মাঝিরা দাড় টেনে নিয়ে যাবে নৌকা।

শহরের মেহমানরা গতকাল চলে গেছে। কামাল ওদের সাথে কত যেতে চাইল কিন্তু মা রাজীই হলো না। মোস্তফাদের বাড়িতে যারা এসেছিলো ঢাকা থেকে তারাও চলে গেছে। ফিরোজ ছেলেটার জন্য কি নিলুর একটু মন খারাপ লাগবে! কে জানে। নিলুকে জড়িয়ে বেশ কথা উঠেছিল। মোস্তফাই ছড়িয়েছিল কথা। মোস্তফা নিলুর প্রতি দুর্বল। কিন্তু নিলু মোস্তফাকে পাত্তা দেয়না। গ্রামের মানুষেরা একটু এ রকম। হঠাৎ কামালের কাছে মামাদের বাড়িটা কেমন শূণ্য হয়ে গেলো। কামাল চলে গেলে খাদিজা আপার জন্য ওর মন খারাপ হবে। খাদিজা আপার বুকের ওম বড় মিষ্টি। খাদিজা আপার বিয়ে হবে কয়দিন পরই। মাজেদার জন্যও খারাপ লাগবে। মাজেদাটা যে কি। কি সব কান্ড করে। একদিন মাজেদাকে খালি গায়ে দেখেছিলো। সবচেয়ে বেশী মন খারাপ হলো মাসুমের জন্য। কেমন

তুল তুলে ছেলেটি। সারাটা খন কামালের সাথে ঘুর ঘুর করতো। কামাল ওকে যে কি আদর করতো।

খালি বাড়িতে কামাল ঘুরে বেড়ায়। কখনো মাজেদার সাথে। কখনও বাদল, ফিরোজ, কুদ্দুসের সাথে অনেক দুর চলে যায়। ওরা তিনজনই মেঝো মামার ছেলে। মাছ ধরে খালে বিলে। কুদ্দুসের সাথে কামালের ভালো বনা বনি নাই। ওরা সবাই এক বয়সী। একবার কুদ্দুসের সাথে খুব ফাইট হয়ে গেলো। কুদ্দুস একটু হিংস্র টাইপ। বাদল খুব নরম মানুষ। ফিরোজটা কুদ্দুসেরই টাইপ। তবে কামালকে কিছু বলেনা। কামালকে বেশী আদর করে আবুল। বয়সে বড় হলেও কামালকে সব জায়গায় নিয়ে যায়। নানা কিছু আজব আজব আইডিয়া আসে আবুলের মাথায়। কামাল খুব মজা পায়। কিন্তু ছোট্ট কামাল তারপরও কেমন শূণ্যতা অনুভব করে। বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কাশেম মামা বলেছে এখন আর তেমন ভয় নেই। সব ঠিক ঠাক মতো চলছে। মুক্তিরা বেশী একটা সুবিধা করতে পারছে না। কামাল মনে মনে ঠিক করলো একদিন পালাবে। একদিন একা একা ঘুরেও এলো লঞ্চ ঘাট থেকে। কেউ কিছু টের পেলো না।

তখন জুলাই মাস। এরমধ্যে বড় মামা হাজম ডেকে কামালের খৎনা করে দিল। কামালের খুব ব্যথা লেগেছিল। কিন্তু কোনো টু শব্দটি কেরনি। খৎনা করার সময় বাড়ি শুদ্ধ লোকজন হামলে পড়েছিল। না জানি কি একটা ব্যাপার ঘটেছে। কুদ্দুসতো ওর বয়সী। কুদ্দুসের খৎনা কবেই হয়েছে। কামালের খুব রাগ হয়েছিল। লজ্জাও পেয়েছিলো। ওর বোনরা কেমন হা করে তাকিয়ে থেকেছিল। সব কিছু ভালো হতে একমাস লেগে গেলো। কামালের ওই জায়গায় ঘা হয়ে গিয়েছিলো। গ্রাম দেশে ওষুধ পাতি নাই কিছু। মাও কিছু খেয়াল করে না। কামাল যখন ভালো হয়ে গেলো তখন হঠাৎ কেমন বড় বড় মনে হতে লাগলো নিজেকে।

৪.

কামালরা শহরের বাড়িতে ফিরে এলো একসময়। আর পালাতে হলো না। স্কুল টিস্কুল খুলে গেছে, আর কি থাকা যায় গ্রামে! মিলিটারিরা শহরের দখল নিয়ে নিয়েছে। অফিস আদালত চলছে। রেডিও টিভির অনুষ্ঠান হচ্ছে যথারীতি। বাড়ির সম বয়সীদের কাছ থেকে গল্প শোনে কামাল। কত কী মিস করেছে। কত কী ঘটে গেছে। মজার মজার সব গল্প করে ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের। কোথায় কোথায় নাকি ফাইট হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা মিলিটারিদের হালুয়া টাইট করে দিচ্ছে। একদিন নাকি কামালদের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে মুক্তিরা এসেছিল। মুখে কাপড় বাধা ছিল। সবাই ওদের খুব খাতির যত্ন করেছে। পরদিনই এসেছিল মিলিটারিরা। কিন্তু কাউকে কিছু বলেনি। হিরা চাচা মিলিটারিদের ম্যানেজ করে ফেলেছে। তার গায়ে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ গন্ধ থাকলেও সে কোনোদিন

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেনি। বরং মিলিটারি আর রাজাকারদের অত্যাচারের হাত থেকে পুরো এলাকাবাসীকে বাঁচিয়েছে। হিরা চাচা ছিলেন খুব বুদ্ধিমান মানুষ। তাছাড়া তার দাপট ছিল পুরো শহরে। ডিসি এসপিরা তাকে খাতির করতো। তার ভয়ে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খেতো। বাড়ির ছোটোরা তার ভয়ে কখনও দুপর বেলা বাইরে বের হতে সাহস পেতোনা। চারিদিকে তার নজর ছিল। এলাকার বিচার সালিশ তিনিই করেন। চোর বাটপারদের নিজের হাতে শায়েস্তা করেন। এমন মার দেন যে তা কামাল দুচোখে দেখতে পারে না। থু থু ফেলে জিব দিয়ে চাটায়। মোটা লাঠি দিয়ে পেটায়। যতক্ষন না অপরাধ স্বীকার করবে ততক্ষন মার চলবে।

জামাল ভাইর কোনো খোঁজ খবর নাই। মা প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। জামাল ভাই বেঁচে আছে কিনা তাইবা কে জানে। সবাই বলা বলি করছে জামাল ইন্ডিয়া গেছে। কেউ বলে সে দেশেই আছে। ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করছে। যে কোনো সময় ফিরে আসবে।

কামাল বাড়ির পুকুরে ঝাপাঝাপি করছিল এক দুপুরে। ওদের বাড়িতে অনেকগুলো পুকুর। এই সময়টায় পুকুর খাল বিল থাকে ভরাট। ওদের পুকুরে জোয়ারের পানি এসেছে। বড় পকুর। ঘোলা পানি উপচে পড়ছে পার ঘেষে। ওরা দৌড়ে এসে পানিতে ঝাপ দিচ্ছে। কে যেনো এসে হঠাৎ খবর দিলো লাশ দেখা যাচ্ছে। লাশ। লাশের কথা শুনেছে কামাল কিন্তু এখনও একটা লাশও দেখেনি। কোথায় লাশ! পাশেই রয়েছে খাল। সেই খালে ভেসে এসেছে একটি লাশ। সাবাই কেমন একটু ভীতু হয়ে আছে। কামালরা দৌড়ে গেলো খাল পাড়ে। দেখলো ধুতি গেঞ্জি পড়া একটা লাশ উপুর হয়ে আছে। কোথা থেকে ভেসে ভেসে এসেছে। এর রকম লাশ কামাল পরে আরো অনেক দেখেছিল।

কামাল মায়ের সাথে আবারও গিয়েছিল ঢাপর কাঠি। সেটা ছিল সেপ্টম্বর মাস। মুক্তিযোদ্ধারা তখন মোটামুটি গুছিয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বড় সড় অপারেশনের খবর শোনা যায়। লঞ্চ থেকে নেমে নৌকায় করে যাচ্ছিল। ওরা সাধানতঃ ঢাপরকাঠির ঘাটে নামে লঞ্চ থেকে। কিন্তু সেবার ওরা কলস কাঠির ঘাটে নেমেছিল। নদী থেকে বড় খালে ঘুকে পড়লো নৌকা। ওরা যাচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছে খালের দুপারের বাড়িঘর থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছে। খাল দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অনেক লাশ। মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। পুরো গ্রাম খালি। মাঝি বললো আগের দিন মিলিটারিরা এসে সব বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। অনেক মানুষকে লাইন দিয়ে গুলি করেছে। এদিকটায় বেশীরভাগই হিন্দু পরিবার। কলসকাঠির এই এলাকাটা হিন্দু অধ্যুষিত। কামার কুমারই বেশী। কয়েকজন বুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। কলস কাঠির হাটের অনেক অংশ জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেবার কামালরা প্রায় তিন চার মাস কলস কাঠি কাটিয়ে ডিসেম্বরে ফিরে এসেছিল। জামাল আর

নিলুর জন্যই মা ঢাপর কাঠি গিয়ে থাকল বেশিরভাগ সময়। মায়ের ধারানা ছিল জামাল হয়ত ঢাপর কাঠিতে এসে তার সাথে দেখা করবে। নিলুর জন্য ভয় ছিল। নিলু ছিল দেখতে সুন্দর। তাকে নিরাপদে রাখার জন্যও মা শহর ছেড়েছিল। মা শুধু কামালকেই পাত্তা দিত না। আর নিলুটা এমনই ও কিছু বলবে না। ওরও যে গ্রাম ভাল লাগে তা না কিন্তু মা যা করবে তাই মেনে নেবে।

ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই সিএন্ডবি রোড। সিএন্ডপি ব্রিজের দুপাশে পরিখা খনন করা হয়েছে ব্রিজ রক্ষার জন্য। সেখানে রাতে পাহারা দেয় আল বদর বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে তারা সারারাত রাইফেলের গুলি ছোড়ে। গভীর রাতে সেই গুলি কামালদের টিনের চালের ঘরের উপর দিয়ে শিশ কেটে চলে যায়। মনে হয় এখনই বুঝি গুলি এসে বিদ্ধ হবে। সারারাত ভয়ে আতংকে ঘুমানো যায়না। একদিন আলম ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জামাল কোথায় আছে সেটা জানার জন্য। আলম ভাইয়ের উপর দুদিন খুব অত্যাচার হয়েছিল। আলম ভাই সোজা বলে দিয়েছে জামাল কোথায় আছে সে জানে না। তাকে মেরে ফেলতে চাইলে ফেলতে পারে।

কামাল ওর বাড়ির সমবয়সীদের নিয়ে পরিকল্পনা করে কিভাবে মিলিটারিদের শায়েস্তা করা যায়। ওরা লাঠি দিয়ে রাইফেল বানায়, বেয়োনেট বানায়। কিন্তু কয়দিন পরই কামালকে চলে যেতে হয় গ্রামে। গ্রামে কোনো মজা নাই। নিস্তরঙ্গ। কামাল একা একা কখনও ঘুরে বেড়ায়। কাশেম মামা কোথায় যেনো গেছে। তার কোনো খবর পাওয়া যায়না। মোস্তাফা গেছে মুক্তিযুদ্ধে। খদিজা আপার বিয়ে হয়ে শশুর বাড়ি চলে গেছে। একদিন কামাল গিয়েওছিল খাদিজা আপার শশুর বাড়ি। খুব আদর করলো খাদিজা আপা কামালকে। আবুল, মাজেদা সবসময় ওকে কাছে কাছে রাখতে চায় তাও কামালের ভাল লাগেনা গ্রাম। মাজেদা হঠাৎ কেমন বড় হয়ে গেছে।

একদিন হয়েছে কী। কয়েকদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। কামাল সেদিন বড় খলার বাড়িতে ঘুমিয়েছিল মায়ের সাথে। খালি বাড়ি। খাদিজা আপা নাই। মেস্তাফা নাই। বালিশের খোলের মধ্যে কিভাবে যেনো পাঁচটা টাকা পেয়ে গেলো কামাল। অভাবের সংসারে টাকাটা অনেক বড় কিছু। টাকা দেখে কামাল ভয়ে কাঁপছিল। কি করবে সে! টুপ করে কামাল টাকাটা প্যান্টের পকেটে পুরে ফেললো। মনে হলো সাত রাজার ধন পেয়েছে। নিলুকে বলেওছিল কথাটা। বোকা নিলু কিছুই বুঝতে পারেনি। সেটা যে টাকা তা বলল না। বেশ কয়েকদিন টাকাটা যত্ন করে রাখলো। ভয়ে ভয়ে ছিল কে কখন দেখে ফেলে। মা দেখলে সর্বনাশ হবে। সেটাই ছিল কামালের জীবনে প্রথম টাকা চুরি। এখন কামাল নিশ্চিন্ত মনে পালাতে পারবে। এখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে চলে যাবে। বাড়ির জন্য মন কাঁদে। মায়ের জন্য পারে না।

একদিন ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেড়িয়ে পরলো কামাল সত্যি সত্যি। একহাটু কাদা ভেঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে লঞ্চঘাট পৌঁছালো। লঞ্চ আসার কথা বারোটায়। কামাল দশটার মধ্যে পৌঁছে যায়। যাতে লঞ্চ মিস না হয়। পাশেই খায়েদের বাড়ি। ভাবল সে বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু যদি লঞ্চ মিস হয়! কামাল ছোট্ট মানুষ। এই ভরা বর্ষার মধ্যে লঞ্চ কী আসবে আজকে! আসলেও কি ওকে নেবে! কে জানে। কাউকে কিছু না বলে চলে আসাটা কি ঠিক হয়েছে! হঠাৎ কেমন ভয় পেলো কামাল। মা যদি চিন্তা করে! কামালকে না পেয়ে মা কান্না কাটি করবে। করুক। কামাল যাবেই। কামাল আর গ্রামে পড়ে থাকতে চায় না।

হঠাৎ কামাল বহুদূর থেকে ভেসে আসা গুম গুম একটা শব্দ শুনতে পেলো। ওর ছোট্ট বুকে ব্যাঙ লাফ দিল। লঞ্চের শব্দ ওটা! অনেকদূরে নদীটার একটা বাঁক আছে। সেই বাঁক ফিরলেই শব্দটা স্পষ্ট হয় এবং লঞ্চটা একটা আকার ধারন করে। প্রথমে সামনেটা দেখা যায়। দূর থেকে মনে হয় যোগাযোগের আশ্চর্য্য একটা বাহন। দেবদূতের মতো। লঞ্চটা কিছুটা সামনে আসতে দেখতে পেলো বৃষ্টির জন্য তেরপল দিয়ে চারদিক ঢাকা। এরকম আর দেখেনি কামাল। কেমন অদ্ভুত লাগছে দেখতে। কামাল ঘাটে একজন প্যাসেঞ্জারও দেখতে পেলোনা যে লঞ্চে উঠবে। এই বৃষ্টিতে কে আর ঘর থেকে বের হয়। লঞ্চ থামার সারেং ঠং ঠং করে ঘন্টি বাজায় ইঞ্জিনরুমে। সেটা দূর থেকেই শোনা যায়। লঞ্চটা ঘাট ছাড়িয়ে যে চলে যাচ্ছে, কই থামলোনাতো। তাহলে কেউ নামারও নেই আজকে! কামাল দুই হাত তুলে লঞ্চটাকে থামার জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু ছোট্ট কামালের কথা সারেং শুনবে কেনো! লঞ্চটা চলো গেলে কামালকে না নিয়েই। পরের লঞ্চ আবার বিকেল চারটায়। এতক্ষন কি বসে থাকা যায়! কামাল মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে রওয়ানা হলো। ওর কাছেতো পয়সা ছিল তাও ওকে নিলনা! ওর চোখের জল বৃষ্টির পানিতে মিশে একাকার হয়ে গেলো। কিন্তু সেদিনের কথা কেউ কোনোদিন জানল না। নিলুও না। (সমাপ্ত)

টরন্টো